***International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)***
*A Peer-Reviewed Monthly Research Journal*
*ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)*
*Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 49-57*
*Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.irjims.com*

# বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য : গঠন-রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী

**তনয়া মুখার্জ্জী**
*জুনিয়র রিসার্চ ফেলো, এস.ভি.এস.জি.সি.(ইউ.জি.সি), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
**ড. সুজয়কুমার মণ্ডল**
*অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

**Abstract**

*Bishnupur, which also lies in the Rarh region, is popularly known as the **'Temple Town'**. It is historically and culturally significant. Bishnupur (Lat 23° 05' N Long 87° 19' E), is situated in the district of Bankura of West Bengal. Numerous terracotta temples are situated in this place which was also are of the most important centre of art in eastern India during 16th-17th century AD. The terracotta temples of Bishnupur were built by the Malla Dynasty. The Malla rulers were the followers of Lord Vishnu and build many legendary terracotta temples in the Rarh region. It is remarkable that a small town like Bishnupur accommodates four architecturally magnificent and significant terracotta temples. Particularly terracotta plaques fixed on temples comprise valuable elements for reconstructing the mythological, historical and socio-cultural heritage. The themes of the terracotta plaques are mainly based on the stories of Ramayana, Mahabharata and myths. Incredible architectural and decorative skills can be traced through the terracotta temples of Bishnupur. These are unique pieces of art and architecture. Architectural style and designing style of the temples of this area reveal the profundity of the artisan. This heritage site has significant values in the society as cultural heritage resources. Moreover, the temple architecture of Bishnupur reveals a rich heritage of the Indian architecture.*

*Our interest is to find out significance and values of the terracotta temples of Bishnupur town from the viewpoint of archaeology and folklore. The present paper will analyze the style, type, design and motifs of these terracotta temples of Bishnupur.*

***Keywords: Terracotta, Architecture, Motif, Temple, Heritage***

**১. ভূমিকা:** রাঢ় বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের এক উল্লেখযোগ্য জনপদ হল 'মন্দির নগরী' বিষ্ণুপুর। পূর্বে বিষ্ণুপুর ছিল প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। রাজ্যটি আজকের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মল্লরাজা বীর হাম্বীর সিংহাসনে বসেন এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই সময় থেকেই বিষ্ণুপুরে একের পর এক টেরাকোটা মন্দির গড়ে ওঠে। কালক্রমে বিষ্ণুপুর 'মন্দির নগরী' বলে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে। এখানকার প্রাচীন টেরাকোটা অলংকরণ সজ্জিত মন্দির স্থাপত্যগুলি গোটা বিশ্বের ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কাছে সমাদৃত। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হল: "বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য : গঠন রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী"। এই প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের গঠন ও অলংকরণের বিষয় সম্পর্কিত পরিচয়ের সূত্রে তার বিশ্লেষণ করা হবে।

**২. রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের পরিচয়:** রাঢ় বাংলা পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের এক প্রাচীনতম জনপদ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ নিয়ে রাঢ় বাংলা গঠিত। রাঢ় বাংলা লালমাটির দেশ, মাটি এখানে সহজলভ্য সুতরাং তার ব্যবহারও বাংলায় সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তাছাড়া বাংলার অধিকাংশ স্থলে পাথরের অভাব থাকায় পাথরের মন্দির বা পাথর খোদাই এর প্রচলন খুব একটা দেখা যায় না; পোড়ামাটি বা টেরাকোটার মন্দির স্থাপত্য তাই অধিক মাত্রায় দেখা যায়।

রাঢ় বাংলায় চৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু সময় আগে থেকে এখানকার নানা স্থানে যে টেরাকোটার অসংখ্য মন্দির স্থাপিত হয় সেগুলির বৈচিত্র্য ও অলংকরণ বাংলার স্থাপত্য ও শিল্পচর্চার মহান উত্তরসূরী রূপে ধরা যায়। রাঢ় বাংলার মন্দিরগুলিকে প্রধানত আমরা চারটি বর্গে বিভক্ত করতে পারি চালা, রত্ন, দেউল এবং দালান।[১] চালার মধ্যে একটিমাত্র চালযুক্তকে ‘একচালা’, দুটি চালাযুক্তকে ‘দোচালা’ বলে। দোচালাকে আবার একবাংলাও বলা হয়, আবার দুটি দোচালাকে সামনে পিছনে যুক্ত করে হয় জোড়বাংলা। এর চারদিকের চাল নিয়ে হয় ‘চারচালা’। চারচালার ওপর আরও চারটি চাল বসিয়ে হয় ‘আটচালা’। তার ওপর আরো ক্ষুদ্রাকৃতি ‘চারচালা’ বসিয়ে বারোচালা পর্যন্ত মন্দির এই রাঢ় বাংলায় দেখা যায়। ‘চালা’ মন্দিরের-সঙ্গে ‘চাঁদনি’, ‘দালান’, শৈলীর মন্দিরের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ‘চাঁদনি’ ও ‘দালানের’ ছাদ সমতল, কিন্তু চালার চাল ঢালু।[২] বাংলার মন্দির স্থাপত্যের উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যায় ‘রত্ন’ শৈলীর মন্দিরের মধ্যেও। চালা, চাঁদনি বা দালানের ছাদে ছোট আকারের দেউলকে চূড়া বা’রত্ন’ রূপে বসিয়ে নতুন আলাদা এক শৈলী বা রীতি সৃষ্টি করা হল। এর ফলে উদ্ভব হল ‘রত্ন’ স্থাপত্যেরই কয়েকটি শ্রেণীর - ‘একরত্ন’, ‘পঞ্চরত্ন’, ‘নবরত্ন’, ‘ত্রয়োদশ রত্ন’, ‘সপ্তদশরত্ন’, ‘একবিংশতিরত্ন’ ও ‘পঞ্চবিংশতিরত্ন’।[৩] রাঢ় বাংলার দেউল রীতির যে অজস্র মন্দির দেখা যায়, সেগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন দেউল মন্দির, যা গ্রামে গঞ্জের সর্বত্রই আমাদের চোখে পড়ে।[৪]

রাঢ় বঙ্গের এক অন্যতম জেলা হল বাঁকুড়া। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরেও মধ্যযুগে মন্দির স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করার মতো। উত্তর ভারতীয়, নাগর রীতির মন্দির ছাড়াও ওড়িশী ‘রেখা’ দেউল রীতির বহু মন্দির বিষ্ণুপুরের নানা স্থলে তৈরি হতে থাকে। বিষ্ণুপুরে প্রাক্ মুসলিম যুগের এই মন্দিরগুলি সবই প্রায় দেউল রীতির ছিল, যার উৎসমূলে ছিল উত্তরভারতের নাগর শৈলীর শিখর মন্দির।[৫] বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে ওড়িশী ‘রেখ’ ও ‘পিঢ়া’ রীতির মন্দির যত বেশী নির্মিত হয়েছে, রাঢ় বঙ্গের অন্য আর কোন জেলায় এতটা দেখা যায় না। প্রাক্ মুসলিম যুগের পর মধ্যযুগে বাংলা তথা রাঢ় অঞ্চলে যে মন্দির চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল তার চরম উৎকর্ষ বাঁকুড়াতেও লক্ষ্য করা যায়। এখানে মল্লরাজাদের আনুকুল্যেই মন্দির শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।[৬]

রাঢ়বাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরে লখ্য করা যায়। ইঁট ও পাথর - এই দুই উপাদানেই গঠিত মন্দির এখানে রয়েছে। তবে ‘টেরাকোটার’ আশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট অলংকরণের জন্য বিষ্ণুপুরের সমকক্ষ আর কোন মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। মধ্যযুগের প্রায় সব রীতির-মন্দিরই বিষ্ণুপুরে নির্মিত হয়েছিল। এগুলি হল - ‘রত্ন’, ‘চালা’, ও ‘দেউল’। এগুলির মধ্যে সর্বোৎকর্ষের জন্য ‘রত্ন’ মন্দিরগুলির কথাই বেশি করে মনে হয়। তবে প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ উল্লেখযোগ্য। রাসমঞ্চের পরেই প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি দেউল রীতির ছিল বলে অনুমান করা যায়। ‘রত্ন’ মন্দিরের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরে‘একরত্নের’ সংখ্যা বেশি। ইঁট ও পাথর উভয় উপাদানেই তৈরি ‘একরত্ন’ মন্দিরগুলি সমগ্র বাংলার মধ্যে এই রীতির স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির মদনমোহনের ‘একরত্ন’ মন্দিরটি। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মূর্তিফলকগুলি ছাড়াও ফুল লতা-পাতার নকশা খুব কম মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকায় কেষ্টরায়ের ‘জোড়বাংলা’ও শ্যামরায়ের ‘পঞ্চরত্ন’ - এই দুটি ইঁটের মন্দির-স্থাপত্যও উৎকৃষ্টমানের অলংকরণের জন্য সুপরিচিত। এ প্রসঙ্গে Archaeological Survey of India থেকে প্রকাশিত ‘বিষ্ণুপুর’ শীর্ষক মনোগ্রাফে উল্লেখ রয়েছে:

> “*From the point of style and structural formulation the temples of Bishnupur can be classified into different groups known to be of deul, chala and ratna style. Besides thase temples, one of the early structures at Bishunupur built by Bir Hambir and known as the Rasa-mancha is a formation quite unique of its kind*”.[৭]

বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলো মন্দিরকে এই রীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন মনে করা যেতে পারে মন্দিরটি কেষ্টরায়ের জন্য রাজা রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকে নয়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের

ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। শেষমধ্যযুগে বাংলার মন্দির শৈলী ও মন্দিরাশ্রিত অলংকরণের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী বিপ্লব উপস্থিত হল, বিষ্ণুপুরে সতেরো শতকের আরম্ভ থেকেই তার গভীর প্রভাব পড়েছিল।[৮]

**৩. বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের গঠন:** গবেষক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরটিকে 'মন্দির নগরী' বলে উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের রাজত্বকালে প্রচুর টেরাকোটা, মাকড়া পাথর ও ঝামা পাথরের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কালের-গতিতে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই অপূর্ব কীর্তি গাঁথা আজ অনেকটা ধবংস হয়ে গেছে। বর্তমানে টেরাকোটা অলংকৃত মন্দিরের সংখ্যা  বিষ্ণুপুরে চারটি। মন্দিরগুলি যেন অসহায়ের মতো হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ধ্বংসের শেষ আঘাত থেকে রক্ষা পেতে ছাইছে। তবে আশার কথা ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (ASI) বিভাগের সহায়তায় মন্দিরগুলির সংরক্ষণ হয়েছে এবং এই মন্দিরগুলি National Heritage এর মর্যাদা পেয়েছে এবং World Heritage site হিসাবে মর্যাদা প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে বলে জানা যায়।

**চিত্র নং ১, রাসমঞ্চ, বিষ্ণুপুর**

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের মন্দির স্থাপত্যে উত্তর ভারতীয় 'নাগর' রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট, যে রীতিটি মগধের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ছাড়াও ওড়িশী 'রেখ' দেউল রীতির  বহু মন্দির বিষ্ণুপুরের নানা স্থানে তৈরি হয়।[৯] বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে ওড়িশী 'রেখ' ও 'পিড়া' রীতির মন্দির যতবেশি নির্মিত হয়েছে, অন্য আর কোন জেলায় এতটা দেখা যায় না। সীমান্ত পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চল ওড়িশার  প্রভাবমণ্ডলের আওতায় দীর্ঘকাল কায়েম থাকার নানা স্থানে জগন্নাথ ও শিব উপাসনার সঙ্গে এইরূপ স্থাপত্য চিন্তারও উন্মেষ ঘটেছিল, তা অনুমান করা যায়। প্রাক্ মুসলিম যুগে উপরিউক্ত মন্দিরগুলির সূত্রপাত হয়েছিল। তার চরম উৎকর্ষ বাঁকুড়াতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত মল্লরাজাদের আনুকূল্যেই এখানে মন্দিরশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বিষ্ণুপুর তো বটেই, বিষ্ণুপুরের বাইরে ইঁট ও পাথর উভয় উপাদানেই নির্মিত 'চালা', 'রত্ন' ও 'দেউল' মন্দিরের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। আকারে, বৈচিত্র্য ও ভিন্নতায় এবং স্থাপত্যকৌশলের চমৎকারিত্বে উক্ত মন্দিরগুলি পশ্চিমবাংলার অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।[১০]

বাঁকুড়া তথা সারা পশ্চিমবাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুর লক্ষ্য করা যায়। ইঁট ও পাথর  এই দুই উপাদানেই গঠিত মন্দির এখানে আছে। তবে টেরাকোটার আশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট অলংকরণের জন্য বিষ্ণুপুরের ইঁটের মন্দিরগুলি সমগ্র বাংলার এক বিস্ময়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের গঠন রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

**রাসমঞ্চ:** বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যকে বিশ্বের দরবারে সর্বাধিক পরিচিতি দান করেছে এই রাসমঞ্চ (চিত্র নং ১)। রাসমঞ্চ হল একটা স্টেজ বা মঞ্চ। এর উপরের অংশ পিরামিড আকৃতির আর তার পরের অংশ বাংলার চালা আকৃতির এবং প্রবেশদ্বার ইসলামীয় স্থাপত্যকে অনুকরণ করে তৈরি হয়েছে। রাসমঞ্চের নিচের দিকটা মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত। ১৫৮৭-১৬০০ সালের মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর এই রাসমঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরটির উচ্চতা হল ৩৫' ও দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৮০' ৩০''। প্রতি বছর রাস উৎসবের সময় অষ্টধাতুর ১০৮ টি রাধা কৃষ্ণের মূর্তি ১০৮ টি প্রদীপ সহ ১০৮ জন ব্রাহ্মণ পূজা করতো। এই সময় প্রজাদের দর্শনের জন্য ঠাকুরগুলিকে গর্ভগৃহের মধ্যে শয়ান দেওয়া হতো। রাসমঞ্চটি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। সবচেয়ে ভেতরের দেওয়ালে বড়ো বড়ো আটকানো থাম রয়েছে। থামগুলিতে পদ্মের আকৃতির মোটিফ দেখা যায়।

**পঞ্চরত্ন:** ১৬৪৩ সালে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নির্মাণ করেন (চিত্র নং ২)। এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা শ্যামরায়, তাই এই মন্দিরটিকে শ্যামরায় মন্দিরও বলা হয়। বর্তমানে মন্দিরটিকে World Heritage Site হিসাবে মর্যাদা প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।  এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির বিশেষত্ব হল মন্দিরটির পাঁচটি চূড়া পাঁচ প্রকারের। মাঝের চূড়াটি ইসলামীয় অষ্টগণ আকৃতির, এছাড়া রয়েছে রেখ দেউলের নিদর্শন। বাংলার চালা রীতিকে অনুসরণ করে এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির নির্মাণ পরিকল্পনা করেন মন্দিরের সেবক বিষ্ণুদাস সরকার। মন্দিরজুড়ে রয়েছে টেরাকোটার ফলক এবং প্রতিটি রত্নের মধ্যেও রয়েছে টেরাকোটার নতোন্নত খোদাই করা ফলক। মন্দিরটি এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে একটা মাত্র খিলানকে কেন্দ্র করে রয়েছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী,

**চিত্র নং ২, পঞ্চরত্ন মন্দির, বিষ্ণুপুর**

উত্তরদিকে নকল দরজা রয়েছে। এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩৫’ ও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩০’৪’’। মন্দিরের দক্ষিণদিকে ত্রিখিলান যুক্ত ঢাকা বারান্দা রয়েছে এবং অন্য তিন দিকের কেন্দ্রীয় চূড়াটি সংস্কারের জন্য সিমেন্ট দিয়ে ঢাকা থাকায় মন্দিরের অন্যান্য চূড়ার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যহীন।

**জোড়বাংলা:** রাজা বীর হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ সালে এই জোড়বাংলা মন্দিরটি নির্মাণ করেন (চিত্র নং ৩)। এই মন্দিরটিকে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোড়ামাটির মন্দিরের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। জোড় বাংলা মন্দিরটি বিষ্ণুপুরে কেষ্টরায় মন্দির নামে সর্বাধিক পরিচিত।

দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায়-৩৫’, দৈর্ঘ্যে ৩৮’৬’’ প্রস্থে ৩৮’ ২’’। মাকড়া পাথরের উচ্চভীতের অপর পোড়ামাটির অলংকৃত টালি বসিয়ে এই মন্দিরটি নির্মিত। দুটি দোচালা রীতির মন্দিরকে পাশাপাশি বসিয়ে তার মাথার অপর আর একটি চারচালা রীতির মন্দিরকে বসিয়ে

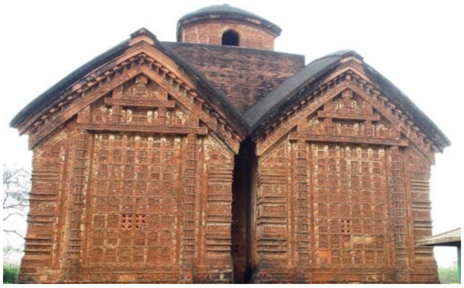

**চিত্র নং ৩, জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর**

এক নতুন ধরনের গঠন শৈলী মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। এই মন্দিরের প্রথম দোচালার নীচে সামনের দিকে ত্রিখিলান দালান ও দ্বিতীয় চালাটির নীচে গর্ভস্থগৃহের অবস্থান। মন্দিরের ভিতরে সামনের দোচালার একপাশ থেকে অপর চারচালার চূড়ায় পৌঁছবার একটি সিঁড়ি রয়েছে। পিছনের পূর্বদিকে গর্ভগৃহে প্রবেশ করার জন্য একটি অতিরিক্ত দরজা রয়েছে।

**একরত্ন:** মল্লরাজ রাজা দুর্জন সিংহ ১৬৯৪ সালে এই একরত্ন মন্দিরটি নির্মাণ করেন (চিত্র নং ৪)। এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা মদনমোহন। এই দেবালয়টি দক্ষিণমুখী। এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট, আর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০’১০’’। সাড়ে চার ফুট উচ্চতায় মাকড়া পাথরের ভিত্তি ভূমির অপর স্থাপিত। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ত্রি-খিলান যুক্ত দালান রয়েছে; এই মন্দিরের দক্ষিণদিকে রয়েছে ভোগগৃহ, যার দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট। বর্তমানে এই ভোগগৃহটির অনেকখানি ছাদ ধসে পড়েছে। এই মন্দিরটি ত্রিখিলান যুক্ত টেরাকোটার অলংকরণে সজ্জিত। এত বড়ো ইঁটের দোচালা সৌধ শুধু বাঁকুড়া নয়, সারা রাঢ়বঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না।

**চিত্র নং ৪, একরত্ন মন্দির, বিষ্ণুপুর**

**৪. বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণের বিষয় ও শৈলী:** রাঢ়বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর ছিল প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যটির রাজধানী। মল্ল রাজারা যখন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসেন তখন এই রাজ্যের নাম হয় মল্লভূম। মল্লরাজ জগৎ মল্ল, মল্লভূমের মৃন্ময়ী মায়ের মন্দির স্থাপন করেন। এরপর মল্লরাজা রাজা বীর হাম্বীর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন মল্লবংশের ঊনচল্লিশতম রাজা। তিনি সিংহাসনে বসার পর শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর থেকেই বিষ্ণুপুরে গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক বিষ্ণু মন্দির ও রাসমঞ্চের মতো সৌধ। মন্দির গাত্রের উৎসর্গলিপি থেকে মন্দিরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়। এবারে আমরা বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির ও স্থাপত্যের অলংকরণ শৈলী ও টেরাকোটা ফলকের বিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

**অলংকরণ শৈলী:** রাঢ়বঙ্গের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য শৈলীর এক অন্যতম স্থান হলো বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের গাত্রে টেরাকোটার ফলকে আমরা পুরাণকেন্দ্রিক, উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক, ঐতিহাসিক, লোকায়ত জীবনকেন্দ্রিক, শৃঙ্গার রসাত্মক, কাল্পনিক প্রভৃতি বিষয়ের চিত্র ফুটে উঠতে দেখি।

সপ্তদশ শতকের মন্দিরচর্চায় বিষ্ণুপুরের মন্দিরনির্মাণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্র অনুসরণের রীতি অবশ্যই ছিল। মল্লরাজারা মন্দিরের ভেতরে এবং বাইরে তাঁদের ধর্মীয় নিষ্ঠার চিহ্ন রেখে গিয়েছেন।

**চিত্র নং ৫, টেরাকোটা ফলক: রাসচক্র ও কৃষ্ণলীলা,**

বিষ্ণুপুরে মন্দির নির্মাণের মধ্যে কৃষ্ণকথা-রামকথার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা চৈতন্য আন্দোলনের বৃহত্তর ফল। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবীয় সংস্কৃত চর্চার ধারায় শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে ও মল্লরাজাদের নির্দেশে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা শিল্পীরা প্রভাবিত হয়েছিল। মধ্যযুগের ও উনিশ শতকের বাংলার নানা শিল্প মাধ্যমের মধ্যে বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য শিল্পের বিষয় ও শৈলীগত সাযুজ্য আছে। মন্দিরের কোথায় কি ধরনের মোটিফ থাকবে তার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। সাধারণত মন্দিরের চারদিকের সবকটি দেওয়ালের মধ্যে অলংকরণ থাকে না। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির চতুর্দিকে টেরাকোটা অলংকরণের উৎকর্ষতা লক্ষিত হয়।[১১] এখানকার মন্দিরের দরজাগুলি পূর্ব বা দক্ষিণমুখী। কোথাও কোথাও আবার ত্রিখিলান যুক্ত প্রবেশপথও চোখে পড়ে এবং নকল দরজা ও জানালা নির্মাণের রীতিও এখানে দেখা যায়, কোথাও কোথাও আবার দশাবতার, দশমহাবিদ্যা ও পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্রও চোখে পড়ে। মন্দিরগুলিতে এক রকম খাড়া ও লম্বা প্যানেলে সমাজদৃশ্যও রয়েছে। এক বা ত্রিখিলানযুক্ত দরজার ওপর রাম রাবণের যুদ্ধ, মহাভারতের যুদ্ধ, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাসমণ্ডল, বিভিন্ন দেবদেবীর ফলকও চোখে পড়ে। মন্দিরের পিলারের গায়েও এ ধরনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র দেখা যায়। এমনকি মন্দিরের চূড়ার ওপরেও টেরাকোটার কাজ লক্ষ্য করবার মতো। খিলানের গায়েও অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি সর্পিল গতির লতা-পাতা ও ফুলকারি নকশার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। মানবভাস্কর্য বহুল প্যানেলগুলির ফাঁকে ফাঁকে লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার চিত্র ব্যবহার করে ক্রমাগত ঘটনাবহুল চিত্র থেকে পর্যটকদের চোখকে বিশ্রাম দিত।[১২] বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মান্দির স্থাপত্যের অলংকরণ শৈলী নিয়ে প্রবীণ গবেষক শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছেন:

> "মন্দির দেওয়ালে টেরাকোটা চিত্রগুলি স্থাপন করার ক্ষেত্রেও একটি সুনির্দিষ্ট রীতি নীতি অনুসৃত হতো বলেই মনে হয়। এর জন্য প্রচুর হিসাব- নিকাশ করে কাজ করতেন শিল্পীরা। টেরাকোটা ফলক বসানোর ক্ষেত্রে মন্দিরের সম্মুখভাগ সমাধিক গুরুত্ব পেলেও অনেক সময় মন্দিরের চারদেওয়াল এমনকি ছাদের শিলিং পর্যন্ত টেরাকোটা চিত্র দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হত। শ্যামরায় ও জোড়বাংলায় এমন অফুরন্ত অলংকরণ লক্ষ করা যায়। সাধারণতঃ মন্দিরের ভিত্তি থেকে সুরু করে মন্দিরের বাঁকানো তলদেশ পর্যন্ত টেরাকোটা টালি দেওয়াই নিয়ম ছিল"।[১৩]

**টেরাকোটা ফলকের বিষয়:** রাঢ় বাংলার অন্তর্ভূক্ত বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ভারত তথা সারা বিশ্বে সমাদৃত। মল্লরাজাদের আমলে তৈরি হওয়া এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণে আমরা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, লৌকিক ইত্যাদি নানা ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাই। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সামাজিক চিত্রও আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়। তাছাড়া আমরা জানতে পারি সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> "বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে দেওয়াল জুড়ে কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি শৈব ও শাক্ত টেরাকোটা মোটিফের বিপুল সমাবেশ এই আদর্শেরই অনুসরণ। এটা শুধু বিষ্ণুপুরের মন্দিরে নয়, পরবর্তীকালের সমস্ত মন্দিরেও এই রীতিরই কমবেশী অনুসরণ দেখা যায়"।[১৪]

এখন নিম্নে আমরা বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের অলংকরণ শৈলী প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

**রাসমঞ্চ:** মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে রাসমঞ্চ অন্যতম। এই পিরামিড আকৃতির চারচালা মন্দিরটিতে আমরা সেভাবে টেরাকোটার কাজ দেখতে পাইনা। এখানে বর্তমানে টেরাকোটা টালির ওপর বসানো কিছু চিত্র আমাদের চোখে পড়ে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মন্দিরটিতে ১০৮ টি দরজা রয়েছে। মন্দিরটির প্রতিটি দরজার দুপাশে বড়ো আকারের পদ্ম ও মঙ্গল ঘটের ফলক দেখা যায় এবং পিলারগুলির নীচের অংশে ছোট আকারের পদ্ম ও বিভিন্ন আকারের ফুল ও পাতার ফলক আমাদের চোখে পড়ে। পূর্বদিকে গেটের পাশে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের নামসংকীর্তনের দৃশ্য, ভক্তদের নাম সংকীর্তনের দৃশ্য, আদিবাসী রমণী, ঢোল বাদনরত নারী, মা সরস্বতী প্রভৃতির ফলক দেখা যায়। তবে এই মন্দিরটি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় অনেক ফলক নষ্ট হয়ে গেছে।

**পঞ্চরত্ন:** টেরাকোটা ফলকের অলংকরণের প্রাচুর্যে ভরপুর রাঢ় বাংলার অন্যতম মন্দির হল শ্যামরায় মন্দির। মন্দিরটিতে রয়েছে ত্রিখিলান যুক্ত ঢাকা বারান্দা, আর এই বারান্দায় রয়েছে অজস্র টেরাকোটার অলংকরণ। এবং পঞ্চরত্নের প্রতিটি রত্নের মধ্যেও রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণের মান ভঞ্জন, আর দুপাশে রয়েছে রাসচক্রের ফলক। মন্দিরটির পিলারের সামনের অংশে রয়েছে কৃষ্ণের রাসলীলা, নবনারীকুঞ্জ, কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ প্রভৃতি দৃশ্য। মন্দিরে প্রবেশের দরজার একেবারে অপরের অংশে দেখা যায় – মহাভারতের যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য। এর মধ্যে কয়েকটি হল – কুরু পাণ্ডবদের যুদ্ধ দৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা, পাশাখেলা, কুরুক্ষেত্রের ময়দানে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি। মন্দিরের পশ্চিমদিকের অংশে রয়েছে সীতার

অগ্নিপরীক্ষা, মৎস্য অবতার প্রভৃতি দৃশ্য। মন্দিরটির দক্ষিণদিকের সামনের অংশে রয়েছে – রাসচক্র, কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণু প্রভৃতি, এবং পূর্বদিকের অংশে রয়েছে রাম রাবণের যুদ্ধ দৃশ্যের কাহিনী ফলক (চিত্র নং ৫)। ।

পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি এখানকার মন্দির টেরাকোটার স্থান করে নিয়ে সমাজ জীবনের চিত্রও। শ্যামরায় মন্দিরে যে বিবিধ সমাজজীবনের চিত্র রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হল – মন্দিরটির পূর্বদিকের সামনের অংশে রয়েছে চুলের বিনুনীর মত নক্‌শা, মূল দরজায় রয়েছে রাস দৃশ্য ও বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির দৃশ্যফলক। দক্ষিণদিকের অংশে রয়েছে চৈতন মহাপ্রভু ও তার ভক্তদের নাম গানের ফলক প্রভৃতি।

**জোড়বাংলা:** বিষ্ণুপুর তথা রাঢ় বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য শৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল জোড়বাংলা মন্দির। এই মন্দিরটিতে প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন আকারের টেরাকোটার ফলক দেখা যায়, যা রাঢ় বঙ্গের আর অন্য কোন টেরাকোটার মন্দিরে দেখা যায় না। এই মন্দিরটির টেরাকোটার অলংকরণে স্থান করে নিয়েছে – পৌরাণিক কাহিনী, সমাজ জীবনের নানান চিত্র, বিভিন্ন পশু এবং ফুল লতা পাতার মোটিফ।

মন্দিরটির একেবারে নীচের অংশে আমরা সামাজিক চিত্রের মধ্যে দেখতে পাই – হাতি, ঘোড়া, দুটো হাতির যুদ্ধ, বাঘ সিংহ, হরিণ, তীর-ধনুক নিয়ে শিকার যাত্রা, চাষির লাঙল চষা, নৌকা বিলাস, মেয়েদের প্রসাধনের ফলক প্রভৃতি। বিষ্ণুপুর যেহেতু বনাঞ্চলে সমৃদ্ধ তাই এখানকার কয়েকটি ফলকের বিষয় হিসাবে দেখা যায় শূকরকে তীর ধনুক হাতে নিয়ে তাড়া করছে শিকারী। তাছাড়া এই মন্দিরের অলংকরণেও ফুটে উঠে বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি এবং নাম সংকীর্তনের দৃশ্য ফলক। এছাড়া রয়েছে রমণীর চুলের বিনুনী বাঁধার দৃশ্য। এখানকার বেশ কয়েকটি টেরাকোটা ফলকের অলংকরণে দেখা যায় নবনারী কুঞ্জ অর্থাৎ নয় জন নারী মিলে একটি হাতির মত আকৃতি তৈরি করছে (চিত্র নং ৬)। এছাড়া রয়েছে নৌকাবিলাসের চিত্র এবং সমাজচিত্রের মধ্যে আরো দেখা যায় একটি পালকী করে জমিদারকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর পালকীর আগে আগে যাচ্ছে সৈন্য সামন্তরা।

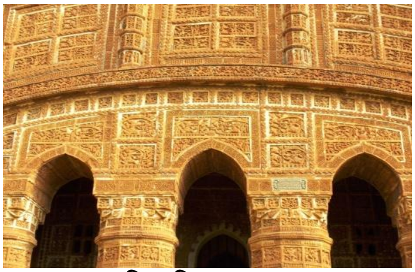
**জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর**

শিকার যাত্রার আর একটি ফলকে দেখা যায় – একটি বাঘ একটি মানুষকে তাড়া করেছে এবং সেহ মানুষাঢ বাঘের তাড়া খেয়ে আতঙ্কিত হয়ে গাছের অপর উঠে গিয়েছে এবং গাছের ওপর থেকে তীর ধনুক নিয়ে বাঘটিকে আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে। সমাজজীবনের চিত্র থেকে নারীদের প্রসাধন করার ফলকও বাদ পড়ে নি। অন্য একটি ফলকে দেখা যায় বিষ্ণুপুরের রাজার উটে করে ভ্রমণ।

বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দিরের অলংকরণেও পৌরাণিক কাহিনীও বাদ পড়েনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক ঘটনাগুলি হল – রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে রয়েছে, অন্ধমুণির জল ভরার দৃশ্য, দশরথ কর্তৃক হত্যা, দশরথকে অভিশাপের দৃশ্য, দশরথের তিন রাণীর পায়েস খাওয়ার দৃশ্য, দশরথের পুত্রদের জন্ম, অস্ত্র শিক্ষা, হরধনু ভঙ্গ, রামের সাথে সীতার বিবাহ, হনুমানের সূর্য ভক্ষণ, বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ এবং পেছন থেকে রামের তীর মারার দৃশ্য, বালী রাবণকে সমুদ্রে চোবাচ্ছে তার দৃশ্য ফলক; এছাড়া রয়েছে সেতু বন্ধনের দৃশ্য, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের সাথে লক্ষ্মণের যুদ্ধ, বানরসেনাদের সঙ্গে রাক্ষসসেনাদের যুদ্ধ প্রভৃতি। মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে জোড় বাংলা মন্দিরে স্থান করে নিয়েছে ভীমের গদা যুদ্ধের দৃশ্য, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন এবং ভীষ্মের যুদ্ধ প্রভৃতি। জোড় বাংলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকের নীচে রয়েছে কৃষ্ণ বলরামের ফলক (চিত্র নং ৭)।

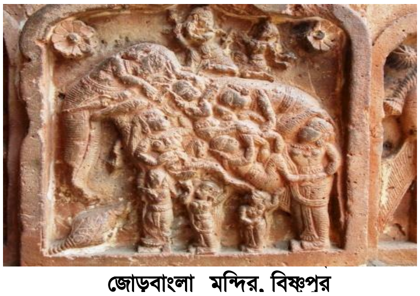
**জোড়বাংলা মন্দির. বিষ্ণুপর**

এছাড়া কৃষ্ণলীলার মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের ষড়ভূজ মূর্তি, কুঞ্জবনে কৃষ্ণের লীলা, বস্ত্র হরণ, কদম্ব বৃক্ষে রাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি। কৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে রয়েছে বকাসুর বধ, ষাঁড়ের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, জলকেলী প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য পৌরাণিক ঘটনা সম্বলিত ফলকও রয়েছে। যেমন একটি ফলকের মধ্যে দেখা যায়, নারায়ণ শুয়ে আছে তার পদতলে রয়েছে লক্ষ্মীদেবী। এখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ফলক দেখা যায়। পিছনের দিকে একটি ফলকে দেখা যায় বুদ্ধদেবকে সুজাতা পায়েস খাওয়াচ্ছে এবং সামনের দিকের অংশে রয়েছে বিষ্ণুর দশাবতারের দৃশ্য। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে জোড় বাংলা মন্দিরে স্থান করে নিয়েছে

হার্মাদ আক্রমণ, নৌকা পথে দুটো জলদস্যুর যুদ্ধ। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকে মল্লাব্দের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া মন্দিরের অলংকরণে ঐতিহাসিক বিষয় দেখা যায় মুঘল সম্রাট শাহাজানের ফলক। দরজা ইসলামীয় স্থাপত্যকে অনুকরণ করে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে পতাকা, বিষ্ণুপুরের রাজার তামাক সেবন করার দৃশ্য প্রভৃতি।

**একরত্ন:** রাঢ় বাংলার মন্দির টেরাকোটার অলংকরণের প্রাচুর্যে ও উৎকর্ষে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দির অন্যতম। এই মন্দিরের অলংকরণে পৌরাণিক ঘটনার মধ্যে দেখা যায় - রাম রাবণের যুদ্ধের কাহিনী, বিষ্ণুর দশাবতার প্রভৃতি। কৃষ্ণলীলার মধ্যে দেখা যায় - কৃষ্ণের মথুরা গমন, কংস বধ, রাজত্ব অধিগ্রহণ, দশাবতারের চিত্র, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, রাসলীলা প্রভৃতি। মদনমোহন মন্দিরে সমাজ চিত্রের মধ্যে নানা বিচিত্র ফলক আমাদের চোখে পড়ে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - রমণীর পুকুর ঘাটে কাপড় কাচার দৃশ্য, ঢোল নিয়ে নারী পুরুষের নৃত্য, রাজ দরবার, রাজার মন্ত্রী ও প্রজাদের নিয়ে রাজ্য চালানো, যুদ্ধ যাত্রা, প্রসাধন, পশু শিকার, অবসর বিনোদন, নাম সংকীর্তনের দৃশ্য, ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে যাওয়া, ঢাল তলোয়ার হাত সৈন্য সামন্ত, নারী পুরুষের নৃত্য গীত, নারীর প্রসাধন, বাতায়নবর্তীনি নারী, বাঘের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ, অশ্বারোহী সৈন্য, হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ যাত্রার ফলক প্রভৃতি।

**৫. টেরাকোটা ফলকের মোটিফ:** টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মোটিফ। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের গাত্রে শুধুমাত্র পৌরাণিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীই পরিলক্ষিত হয়নি, এর সঙ্গে সঙ্গে ফুল লতা পাতার বিভিন্ন মোটিফও পরিলক্ষিত হয়েছে। মদনমোহন মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির, শ্যামরায় মন্দির প্রভৃতি মন্দিরগুলিতে উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক, প্রাণী জগৎ কেন্দ্রিক, সৌরজগৎ কেন্দ্রিক, জ্যামিতিক নক্শা ও বিবিধ ধরনের মোটিফ পরিলক্ষিত হয়:

**ক)** উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে রাসমঞ্চে পরিলক্ষিত হয় ১০৮ টি দরজার দুপাশে বড়ো আকারের পদ্ম, পিলারগুলির নীচে রয়েছে ছোট আকারের পদ্ম ও বিভিন্ন আকারের ফুল ও পাতার মোটিফ। পঞ্চরত্ন মন্দিরে উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে স্থান পেয়েছে পদ্ম ও পদ্মের কুঁড়ির মোটিফ, সর্পিল গতির বিভিন্ন আকারের পাতা, লতা যুক্ত পাতা ফুল ইত্যাদি। জোড়বাংলা মন্দিরের দরজার ওপরের অংশে রয়েছে পদ্ম ও পদ্মের কুঁড়ি, বৃন্তযুক্ত পদ্ম, কদম গাছ প্রভৃতি। মদনমোহন মন্দিরে রয়েছে অধিক পরিমাণে বড়ো চাকা যুক্ত পদ্ম, বিভিন্ন আকার ও আয়তনের ফুল ও লতা পাতা, মন্দিরের পেছনের অংশে রয়েছে ফুল যুক্ত গাছ ও চারপাশে চারটে পাতা বিশিষ্ট একধরনের ফুল।

**খ)** প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে রাসমঞ্চে স্থান পেয়েছে - হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি। পঞ্চরত্ন মন্দিরে প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক যে সব মোটিফ রয়েছে সেগুলি হল মৎস্য, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, বানর, অস্ট্রিচ পাখি, হাঁস, ময়ূর, গরু প্রভৃতি (চিত্র নং ৮)। মদনমোহন মন্দিরে অধিক মাত্রায় প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে স্থান পেয়েছে - হাঁস ও ময়ূরের ফলক। এছাড়া রয়েছে বানর, সাপ, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি।

**গ)** সৌরজগৎকেন্দ্রিক মোটিফগুলির মধ্যে এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে স্থান করে নিয়ে সূর্য, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, তারা প্রভৃতি।

**ঘ)** জ্যামিতিক নক্শা কেন্দ্রিক যেসব মোটিফ এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে রয়েছে সেগুলি হল - ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, সরলরেখা, দাড়ি, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, আয়তক্ষেত্র ইত্যাদি।

চিত্র নং ৮, টেরাকোটা ফলক: অস্ট্রিচ পাখি, পঞ্চরত্ন মন্দির, বিষ্ণুপুর

উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক, প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক, সৌরজগৎকেন্দ্রিক, জ্যামিতিক নক্শা যুক্ত মোটিফ ছাড়াও বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে আরো যে সব ধরনের মোটিফ স্থান পেয়েছে সেগুলি হল - বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি ও পদচিহ্ন, নৌকা, নৌকার দাঁড়, ধানের শিষ, পালকী, বন্দুক, লাঙল, তীর-ধনুক, সিংহাসন প্রভৃতি।

**উপসংহার:** বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির স্থাপত্যের গঠন ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী বিষয়ক এই প্রবন্ধে আমরা বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের রীতি শৈলী ও অলংকরণকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। স্থাপত্যশৈলী ও অলংকরণের অসাধারণ নৈপূণ্য বিষ্ণুপুরের মন্দির স্থাপত্যকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে নিঃসন্দেহে। এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যও বৈচিত্র্যময়, কিন্তু কালের গতিতে ও সঠিক সংরক্ষণের অভাবে এই অসাধারণ কীর্তি গাঁথা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন দরকার সঠিক পদ্ধতিতে সেগুলিকে সংরক্ষণ করা। আর এর জন্য ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগকে আরো সহযোগিতার

হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থানীয় মানুষ, লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব প্রেমী মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এইসব মন্দিরগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে, তবেই বাংলার টেরাকোটা শিল্পের এই মহান কীর্তি সুরক্ষিত থাকবে।

***তথ্যদাতার পরিচয়:***

*ক্ষেত্রসমীক্ষা: ফেব্রুয়ারি ১৭-২৩, ২০১৫, তথ্যদাতা: চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত (৯০), সব্যসাচী সরকার (৪০), সমীর মাঝি (৩৪), বলাই দাস (৬০), রানু সরকার (৭০), মদন মাঝি (৪৫), নিলা ব্যানার্জি (৬৫), রাজু রাই (৪০); বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।*

***তথ্যসূত্র:***


১. *রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, মেদিনীপুর, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং-৫৭।*
২. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৫৭।*
৩. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৫৮।*
৪. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৫৮।*
৫. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৬২।*
৬. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৬২।*
৭. *Biswas,SS, Bishunupur, Archaeological Survey of India, Govt. of India, New Delhi, 2003, Pp. 9.*
৮. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৬২-৭০।*
৯. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৬১।*
১০. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১, পৃষ্ঠা নং-৬২।*
১১. *বসু, শ্রীলা ও অভ্র, বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃষ্ঠা নং ৪২।*
১২. *দাসগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন, ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির- টেরাকোটা, দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা নং ৩৫৪।*
১৩. *পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১২, পৃষ্ঠা নং-৮১।*


**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:**


1. আহমেদ, তোফায়েল, আমাদের প্রাচীন শিল্প(দ্বিতীয় সংস্করণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।
2. চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪১৯।
3. দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন, ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির- টেরাকোটা, দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০০।
4. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, বাঁকুড়ার মন্দির, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৪।
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, প: ব: সরকার, ১৯৭১।
6. বসু, শ্রীলা ও অভ্র, বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, সিগনেট প্রেস, ২০১৫।
7. মণ্ডল, সুজয়কুমার, লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, নটনম্‌কোলকাতা, কলকাতা, ২০১১।
8. রায়, প্রণব, মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, প: ব: সরকার, ১৯৮৬।
9. রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, পূর্বাক্তি প্রকাশনী, তমলুক, ১৯৯৯।
10. সাঁতরা তারাপদ, পশ্চিমবাংলা ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৮।
11. Biswas,SS, Bishunupur, Archaeological Survey of India, Govt.of India, New Delhi, 2003.
12. Chowdhury, Saifuddin, Early Terracotta Figure of Bangladesh, Bangla Academy, Dhaka, 2000.
13. Dasgupta, Prodosh, Temple Terracotta of Bengal, Craft Museum, Delhi.
14. Dutta, Gurusaday, Folk Arts & Crafts of Bengal: The Collected Papers, Calcutta, 1990.

15. George, Michell(ed.), Brick Temples of Bengal, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983
16. L.S.S.O, Malley, Bengal District Gazetteers-Bankura, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908
17. Mc Cutchion, David J, The Temples of Bankura District, Writers Workshop, Calcutta, 1967.
18. McCutchion, David J, Late Mebiaeval Temples of Bengal- Origin and Classification, The Asiatic
19. Society Monograph Series, Vol.XX, Calcutta, 1992.

**Website:**

1. http://enwikipedia.org/wiki/List-of-temples-in-Bishnupur, viewed on 11/02/2015
2. www.Bishnupur.org, viewed on 04/02/2015
3. Soumyaganguly.tripod.com, viewed on 20/05/2015
4. https//rangandutta.wordpress.com, viewed on 11/06/2015
5. http://www.chitrolekha.com/V1/n2/04_terracotta_Architecture_of_Bankura_technoogy.pdf, viewed on 11/06/2015